[২০১৮] ৩ এস. সি. আর. ১০৩৩

সিস্টার অফ সেন্ট জোসেফ অফ ক্লুনি

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

(২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৯৪৫)

১৮ই এপ্রিল, ২০১৮

[আদর্শ কুমার গোয়েল এবং আর. এফ. নরিমান, বিচারপতিদ্বয়]

জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০০৪:

ধারা ১০(১) এবং ১১(চ) – শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা ঘোষণা – আপিলকারী সোসাইটি প্রশ্নবিদ্ধ কলেজটিকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিল – এরপর, কলেজের জন্য সংখ্যালঘু মর্যাদা চাওয়া হয় – জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিশন (এনসিএমইআই) কলেজটিকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করে এবং সংখ্যালঘু মর্যাদার সনদপত্র জারি করে – সোসাইটি এবং কলেজের গভর্নিং বডি রিট পিটিশন দাখিল করে – হাইকোর্ট এই ঘোষণা এবং ফলস্বরূপ সনদপত্র জারিকে অবৈধ ঘোষণা করে এই যুক্তিতে যে এনসিএমইআই-এর এই ধরনের ঘোষণা করার কোনো মূল এখতিয়ার নেই – আপিলে,স্থির করে: ধারা ১১(চ) একটি ব্যাপক বিধান যা এনসিএমইআই-কে একটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং তার মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয় – ২০০৬ সালের সংশোধনী আইনের পর, যোগ্য কর্তৃপক্ষের একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা আছে – তবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর যেকোনো পর্যায়ে সংখ্যালঘু মর্যাদা ঘোষণার জন্য, এনসিএমইআই-এর ক্ষমতা আছে – সুতরাং, বর্তমান ক্ষেত্রে, ধারা ১১(চ) এনসিএমইআই-কে প্রশ্নবিদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা সংক্রান্ত সনদপত্র জারি করার এখতিয়ার প্রদান করে – অতএব, এনসিএমইআই-এর আদেশগুলি বৈধ – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ৩০।

আপিলগুলি খারিজ করে আদালত

আদেশঃ ১. ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সকল সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার মৌলিক অধিকার প্রদান করে। ধারা ১১(চ) জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিশনকে একটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং তার মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়। "সমস্ত প্রশ্ন" এবং "সম্পর্কিত" উভয় অভিব্যক্তিই ব্যাপক অর্থ বহন করে,

যা এনসিএমইআই-কে একটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্‌ভূত হতে পারে এমন যেকোনো প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে।ধারা ১১(চ) এর অধীনে ক্ষমতা, যদি এটি নিজেই পড়া হয়, তবে এটি এনসিএমইআই-কে একটি সংখ্যালঘু কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং/অথবা পরিচালনা করার অধিকার সম্পর্কিত উদ্‌ভূত যেকোনো প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেবে। এতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, যাতে এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীনে নিশ্চিত মৌলিক অধিকারের সুবিধা নিতে পারে।

২. তবে, ধারা ১০(১), যা ২০০৬ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা ধারা ১১(চ)-এর সাথে একই সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল, ধারা ১১(চ)-এ বিদ্যমান উল্লিখিত ক্ষমতার একটি দিক নির্দিষ্ট করে, যেমন একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার সূচনালগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রদান। সুতরাং, ২০০৬ সালের সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পর যে কোনো ব্যক্তি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তাকে উক্ত উদ্দেশ্যে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির জন্য কেবলমাত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। এটি বলা যাবে না যে উক্ত ক্ষমতাগুলি সমবর্তী। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করলে, ২০০৬ সালের সংশোধনী আইনের পর একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সমস্ত আবেদন কেবল আইন অনুসারে গঠিত যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছেই যাবে। অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর যেকোনো পর্যায়ে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর মর্যাদা ঘোষণার জন্য, এনসিএমইআই-এর সেই প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতা থাকবে।

৩. অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীনে মৌলিক অধিকার মওকুফ করা যায় না। নর্থ বেঙ্গল বিশ্ববিদ্যালয় এনসিএমইআই-এর ০৫.১১.২০০৯ তারিখের আদেশ গ্রহণ করেছে, যেখানে এনসিএমইআই কলেজের সংখ্যালঘু মর্যাদার প্রশ্নে প্রবেশ করেছিল। অতএব, এই বিষয়টি একটি গভর্নিং বডির ইচ্ছায় নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ফেরত পাঠানো সঙ্গত হবে না, কারণ সেই গভর্নিং বডি এখন আর সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজ পরিচালনা করার দাবি করতে পারে না। যেহেতু কলেজটি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ভিত্তিতে নতুন গভর্নিং বডি গঠিত হয়েছে, তাই সমান্তরাল গভর্নিং বডি, যা নিজেদেরকে চালিয়ে যাওয়ার দাবি করে, নতুন গভর্নিং বডি গঠনের পর তার আর দাঁড়ানোর কোনো ভিত্তি নেই।

যেহেতু বিষয়টি এমন, তাই নতুন করে মেধার ভিত্তিতে শুনানির জন্য বিষয়টি এনসিএমইআই-এর কাছে ফেরত পাঠানোর প্রয়োজন নেই।

৪. বিদ্যমান সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে, ধারা ১১(চ) স্পষ্টভাবে এনসিএমইআই-কে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সংক্রান্ত একটি সনদপত্র জারি করার এখতিয়ার প্রদান করে। ২৩.১০.২০০৭ তারিখের আদেশ এবং ২৫.১০.২০০৭ তারিখের সনদপত্র আইনত বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো।

গভর্নিং বডি অফ পি.এ.ই.এম. কলেজ বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য - ৬.১২.২০১২ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত; কর্পোরেট এডুকেশনাল এজেন্সি বনাম জেমস ম্যাথিউ (২০১৭) ১৫ এসসিসি ৫৯৫ - নির্ভরশীল।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১৭) ১৫ এস. সি. সি ৫৯৫	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৩৯৪৫।

২০১৩ সালের এফ. এম. এ নং ৩৫৭৯-এ কলকাতা হাইকোর্টের ১৩.০৭.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০১৮ সালের সি. এ. নং ৩৯৪৬,৩৯৪৭,৩৯৪৮,৩৯৪৯ এবং ৩৯৫০ সহ।

শ্রী সঞ্জয় হেগড়ে, শ্রী চন্দর উদাই সিং, সালমান খুরশিদ, ড. রাজীব ধাওয়ান, প্রবীণ আইনজীবী, ফুজায়েল আহমেদ আইয়ুবি, আব্দুল কাদির, ইবাদ মোশতাক, শ্রীমতী অদিতি গুপ্তা, প্রাঞ্জল কিশোর, রোমি চ্যাকো, বরুণ মুদগল, চন্দন কুমার মণ্ডল, ইমতিয়াজ আহমেদ, শ্রীমতী নাগমা ইমতিয়াজ, মোহাম্মদ ফারহান খান, আহমেদ জারঘাম, শ্রীমতী আমরা মুসাভি, শ্রীমতী গীতাঞ্জলি কাপুর, এম. রোশনি আনন্দ, শ্রীমতী আমনা, এম/এস ইকুইটি লেক্স অ্যাসোসিয়েটস, অরুণাভ চৌধুরী, কর্মা দর্জি, শ্রীমতী শ্রুতি চৌধুরী, অনুপম লাল দাস, হর্ষ হিরু গুরসাহানি, শ্রীমতী আস্থা শর্মা, অমিত বর্মা, এম/এস পিএলআর চেম্বার্স অ্যান্ড কোং, টি. ভি. জর্জ, দুষ্যন্ত কুমার, রাকেশ তানেজা, পিজুশ কে. রায়, শ্রীমতী কাকলী রায়, রাজন কে. চৌরাসিয়া, আইনজীবীরা, উপস্থিত পক্ষগণের পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন

আর. এফ. নারিমান, বিচারপতি-

১. অনুমতি মঞ্জুর করা হলো।

২. বর্তমান আপিলগুলির ব্যাচ সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, সুবিধার খাতিরে,২০১৬ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ৩৫৭৮৬,থেকে উদ্ভূত দেওয়ানী আপিলের তথ্যগুলি নেওয়া হয়েছে।

সিস্টার্স অফ সেন্ট জোসেফ অফ ক্লুনি হলো একটি সমিতি যা পশ্চিমবঙ্গ সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৯৬১ এর অধীনে ২৬.০৩.১৯৭৩ তারিখে নিবন্ধিত হয়েছিল। আবেদনকারী-সমিতির মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশনের ধারা ৩(খ) তে বলা হয়েছে:

"কলেজ, স্কুল, প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, আবাসন, সমিতি, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, বা অন্য কোনো কার্যক্রম যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, প্রাথমিকভাবে ক্যাথলিকদের জন্য কিন্তু ধর্ম, জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় বা সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে অন্য সকল ব্যক্তির জন্যও, সেগুলির অধিগ্রহণ, গ্রহণ, ভাড়া দেওয়া, প্রদান, প্রতিষ্ঠা, সহায়তা, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনা এবং/অথবা চালানো।"

৩. সমিতি, ১৬.১২.১৯৯৭ তারিখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অফ কলেজস-কে সম্বোধন করে একটি চিঠিতে স্পষ্ট করে জানিয়েছিল যে, তারা সংখ্যালঘু মর্যাদা বা বিশেষ সুবিধা চায় না – তারা ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। ১০.০১.১৯৯৮ তারিখে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সপেক্টর অফ কলেজস তার পরিদর্শন প্রতিবেদন জমা দেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রাথমিকভাবে সমিতি প্রস্তাবিত কলেজের জন্য সংখ্যালঘু মর্যাদা পেতে ইচ্ছুক ছিল। তবে, তারা পরবর্তীতে তাদের মত পরিবর্তন করে। ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, ২১.০৭.১৯৯৮ তারিখের তার চিঠি দ্বারা, ক্লুনি উইমেনস কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করেন এই ভিত্তিতে যে এটি একটি অ-সংখ্যালঘু ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হবে। এই ভিত্তিতে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলির গভর্নিং বডি সম্পর্কিত সংবিধির ১ নং সংবিধি অনুসারে কলেজের প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয়। ১৩.০৯.২০০৪ তারিখে, বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩-২০০৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্লুনি উইমেনস কলেজকে স্থায়ী অনুমোদন দেয়।

৪. আরও একবার মত পরিবর্তনের পর, সমিতি ২৭.০৬.২০০৭ তারিখে জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিশন (এরপর থেকে এনসিএমইআই হিসাবে উল্লিখিত) এর চেয়ারম্যানকে একটি চিঠি জারি করে, ক্লুনি উইমেনস কলেজের জন্য একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সনদপত্র জারির অনুরোধ জানায়। এনসিএমইআই ২৩.১০.২০০৭ তারিখে উক্ত মহিলা কলেজটিকে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করে একটি একতরফা আদেশ পাশ করে। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে, ২৫.১০.২০০৭ তারিখে, এনসিএমইআই একটি সংখ্যালঘু মর্যাদা সনদপত্র জারি করে। ০৫.০৯.২০০৮ তারিখে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার উক্ত সনদপত্র বাতিলের জন্য একটি আবেদন দাখিল করেন। এই আবেদনটি ০৫.১১.২০০৯ তারিখে এনসিএমইআই কর্তৃক খারিজ করা হয়।

৫. এই ঘটনাগুলির ফলে সমিতি ২০১০ সালের রিট আবেদন নং ৪৪০৬ দায়ের করে, যেখানে নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা হয়:

"ক. উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিচালনা পর্ষদ সম্পর্কিত আইনের ১ নং ধারাটি অতি-অবৈধ এবং অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা;

খ. একটি ম্যান্ডামাস রিট বা অন্য কোনো রিট, নির্দেশনা বা আদেশ জারি করে তৃতীয় উত্তরদাতাকে ক্লুনি উইমেনস কলেজের গভর্নিং বডির কার্য সম্পাদন থেকে বিরত রাখা এবং আবেদনকারী সমিতি কর্তৃক গঠিত ক্লুনি উইমেনস কলেজের গভর্নিং বডির কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা থেকে তাদের বিরত রাখা।"

৬. একইভাবে, ক্লুনি উইমেনস কলেজের গভর্নিং বডি (এখানে ৩ নং উত্তরদাতা), যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুসারে গঠিত গভর্নিং বডি ছিল, তারাও ২০১০ সালের রিট আবেদন নং ৫০০২(ডব্লিউ) দায়ের করে, যেখানে তারা নিম্নলিখিত প্রার্থনা করে:

"(ক) একটি ম্যান্ডামাস রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির কোনো রিট জারি করা হোক, যা উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষকে ৩ নং উত্তরদাতা কর্তৃক ২৫শে অক্টোবর, ২০০৭ তারিখের এফ. নং ৫০৬ নম্বরের তথাকথিত ঘোষণাটি অবিলম্বে বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার এবং/অথবা ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেবে।

(খ) একটি ম্যান্ডামাস রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির কোনো রিট জারি করা হোক, যা উত্তরদাতাদের, বিশেষ করে ৪, ৫ এবং ৬ নং উত্তরদাতাদের, ৩ নং উত্তরদাতা কর্তৃক ২৫শে অক্টোবর, ২০০৭ তারিখের এফ. নং ৫০৬ নম্বরের তথাকথিত ঘোষণার ভিত্তিতে কোনো প্রকার কার্য করা এবং/অথবা আরও কার্য করা এবং/অথবা কোনো পদক্ষেপ নেওয়া এবং/অথবা কোনো অধিকার দাবি করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেবে।

(গ) একটি ঘোষণা জারি করা হোক, যেখানে ঘোষণা করা হবে যে ২ নং উত্তরদাতার কোনো বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করার কোনো এখতিয়ার নেই।

(ঘ) একটি ম্যান্ডামাস রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির কোনো রিট জারি করা হোক, যা উত্তরদাতাদেরকে ৯ নং উত্তরদাতা কর্তৃক ২০১০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তথাকথিত চিঠিটি অবিলম্বে বাতিল এবং/অথবা প্রত্যাহার এবং/অথবা ফিরিয়ে নিতে নির্দেশ দেবে।

(ঙ) একটি ম্যান্ডামাস রিট এবং/অথবা ম্যান্ডামাসের প্রকৃতির কোনো রিট জারি করা হোক, যা উত্তরদাতাদের, বিশেষ করে ৯ নং উত্তরদাতাকে, আবেদনকারীর দ্বারা ২০১০ সালের ২৯শে জানুয়ারী গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, কালিম্পং শাখা, জেলা-দার্জিলিং-এ পরিচালিত এস.বি. অ্যাকাউন্ট নং ৩৯৩৬ ০২০১ ০০০ ৩৪৯৫ পরিচালনা করার অনুমতি দিতে নির্দেশ দেবে।"

(চ) একটি সার্টিওরারি রিট এবং/অথবা সার্টিওরারির প্রকৃতির কোনো রিট জারি করা হোক, যা উত্তরদাতাদেরকে ৩ নং উত্তরদাতা কর্তৃক ২৫শে অক্টোবর, ২০০৭ তারিখের এফ. নং ৫০৬ নম্বরের তথাকথিত ঘোষণা এবং ৯ নং উত্তরদাতা কর্তৃক ২০১০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের তথাকথিত চিঠির ভিত্তি গঠনকারী মামলার সম্পূর্ণ রেকর্ড এই মাননীয় আদালতের কাছে প্রেরণ করার নির্দেশ দেবে এবং এইভাবে প্রত্যয়িত হলে তা বাতিল করা হোক, যাতে ন্যায় বিচার করা যায়।"

৭. একজন বিজ্ঞ একক বিচারক উভয় রিট আবেদন নিষ্পত্তি করেন এই মর্মে যে, ক্লুনি উইমেনস কলেজের সংখ্যালঘু মর্যাদা ঘোষণার জন্য এনসিএমইআই-এর কোনো মূল এখতিয়ার ছিল না, যার ফলস্বরূপ ২৩.১০.২০০৭ তারিখের আদেশ এবং এর ভিত্তিতে জারি করা সনদপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ডিভিশন বেঞ্চে একটি আপিলও একই ফলাফল নিয়ে আসে।

৮. এনসিএমইআই-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় আর. হেগড়ে আমাদের সামনে যুক্তি দিয়েছেন যে, জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০০৪ (এরপর থেকে ২০০৪ সালের আইন হিসাবে উল্লিখিত) এর ধারা ১০(১) এবং ধারা ১১(চ) এর সঠিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যে প্রতিষ্ঠান একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা চায়, তার কাছে দুটি বিকল্প আছে: হয় ২০০৪ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা, অথবা সরাসরি এনসিএমইআই-এর কাছে আবেদন করা। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, একটি মূল আবেদন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, যা ধারা ১১(চ)-এ অন্তর্ভুক্ত, তা ধারা ১২ক এবং ১২খ-তে অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতা থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র, যা এনসিএমইআই-এর একটি আপিল ক্ষমতা। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, ২০০৪ সালের আইনকে এমন একটি আইন হিসাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যা তিন ধরনের কর্তৃপক্ষের উপর সমবর্তী ক্ষমতা প্রদান করে, যথা: আইন দ্বারা গঠিত যোগ্য কর্তৃপক্ষ, এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত কর্তৃপক্ষ, এবং এনসিএমইআই। তার মতে, অতএব, রায়টি আইনগতভাবে ভুল ছিল এবং বাতিল করা উচিত।

৯. আবেদনকারী-সমিতির পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী চন্দর উদয় সিং কষ্ট করে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন যে, এমনকি বিতর্কিত রায় অনুসারেও এটি স্পষ্ট ছিল যে, সমিতি যখন আবেদন করেছিল তখন একটি নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য আইন অনুসারে গঠিত কোনো যোগ্য কর্তৃপক্ষ ছিল না, যার কাছে সমিতি আবেদন করতে পারত। ফলস্বরূপ, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, এটি স্পষ্ট যে শুধুমাত্র এনসিএমইআই-এর কাছেই সমিতি যেতে পারত। উপরন্তু, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান ছিল যা ২০০৪ সালের আইন কার্যকর হওয়ার আগে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাই এর মর্যাদা একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করার জন্য এটি শুধুমাত্র ধারা ১১(চ) এর অধীনে যেতে পারত।

ধারা ১০(১), বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, শুধুমাত্র একটি নতুন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার সীমিত উদ্দেশ্যের জন্য, যার জন্য ২০০৪ সালের আইন অনুযায়ী গঠিত যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে যেতে হবে। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, তাই বিতর্কিত রায় বাতিল করার যোগ্য।

১০. উত্তরদাতা নং ৩-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রাজীব ধাওয়ান, আমাদেরকে ১৯৯২ সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন এবং ২০০৪ সালের আইনের বিভিন্ন বিধান বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ২০০৪ সালের আইনটি ২০০৬ সালে এবং তারপর ২০১০ সালে সংশোধিত হয়েছিল, যার ফলে এই অবস্থান তৈরি হয়েছে যে, ধারা ১০ শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে সনদপত্র প্রদানের বিষয় নিয়ে কাজ করবে যিনি প্রথমবারের মতো একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক। অন্যথায়, ধারা ১১(চ) এর অধীনে এনসিএমইআই-এর কার্যকারিতা এতটাই ব্যাপক হবে যে, ২০০৪ সালের আইন কার্যকর হওয়ার আগে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবীর মতে, এটি স্পষ্ট ছিল যে ক্লুনি উইমেনস কলেজ একটি ধর্মনিরপেক্ষ কলেজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০০৭ সালেই শুধুমাত্র সমিতি এটিকে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করার জন্য মত পরিবর্তন করেছিল। যেহেতু এনসিএমইআই কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশই এমন একটি কলেজকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বেছে নেওয়ার পর সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করেনি, তাই এই মামলাটি এনসিএমইআই-এর কাছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ফেরত পাঠানো উচিত।

১১. আমরা সকল পক্ষের উপস্থিত আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি।

১২. ২০০৪ সালের আইন প্রাথমিকভাবে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সরাসরি অধিভুক্তি প্রদানের ধারণায় গঠিত হয়েছিল। এটি পরবর্তীতে দুবার সংশোধিত হয়েছিল এনসিএমইআই-এর কার্যকারিতা এবং আধা-বিচারিক ক্ষমতা আরও বিস্তৃত ও প্রসারিত করার জন্য। আমাদের আলোচনার জন্য প্রাসঙ্গিক ধারাগুলি নিচে দেওয়া হলো:

"২. সংজ্ঞা— এই আইনে, প্রসঙ্গ অন্য কিছু দাবি না করলে,—

(কক) "উপযুক্ত সরকার" মানে,—

(i) সংসদের কোনো আইন অনুযায়ী তার অধ্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকার; এবং

(ii) অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যা কোনো রাজ্য আইন অনুযায়ী তার অধ্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃত, সেই রাজ্য সরকার যার এখতিয়ারে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) "কমিশন" মানে ধারা ৩ এর অধীনে গঠিত জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কমিশন;

(গক) "যোগ্য কর্তৃপক্ষ" মানে সংখ্যালঘু কর্তৃক তাদের পছন্দসই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ;

২০০৪ সালের আইন প্রণয়নের পর থেকে ধারা ১০ তিন ধাপে সংশোধিত হয়েছে:

প্রথম ধাপ (২০০৪ সালে প্রণীত)

১০. একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি তফসিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি চাওয়ার অধিকার:

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন, একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তার পছন্দের একটি তফসিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি চাইতে পারে।

(২) তফসিলি বিশ্ববিদ্যালয় যে রাজ্যে উপধারা (১) এর অধীনে অধিভুক্তি চাওয়া সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত, সেই রাজ্যের সরকারের সাথে পরামর্শ করবে এবং অধিভুক্তি মঞ্জুর করার আগে সেই সরকারের মতামত বিবেচনা করা হবে।

দ্বিতীয় ধাপ (২০০৬ সালে সংশোধিত)

১০. একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার:

(১) যে কোনো ব্যক্তি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক হলে, তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন।

(২) যোগ্য কর্তৃপক্ষ,—

(ক) নথি, হলফনামা বা অন্যান্য প্রমাণ, যদি থাকে, পরীক্ষা করে; এবং

(খ) আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, উপধারা (১) এর অধীনে দাখিল করা প্রতিটি আবেদন যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত নেবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করবে, যেমনটি পরিস্থিতি অনুসারে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়, সেখানে যোগ্য কর্তৃপক্ষ তা আবেদনকারীকে জানাবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে অনাপত্তি সনদ প্রদানের জন্য আবেদন প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে—

(ক) যোগ্য কর্তৃপক্ষ যদি এই ধরনের সনদপত্র প্রদান না করে; অথবা

(খ) যেখানে একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তা সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে জানানো হয়নি,

সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে যোগ্য কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান করেছে।

(৪) আবেদনকারী, অনাপত্তি সনদপত্র প্রাপ্তির পর অথবা যেখানে যোগ্য কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান করেছে বলে বিবেচিত হয়, সেখানে আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী ও প্রবিধান অনুসারে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা শুরু করতে এবং তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অধিকারী হবে।

ব্যাখ্যা — এই ধারার উদ্দেশ্যে,—

(ক) "আবেদনকারী" মানে এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উপধারা (১) এর অধীনে আবেদন করেন;

(খ) "অনাপত্তি সনদপত্র" মানে একটি সনদপত্র যেখানে উল্লেখ করা থাকে যে, যোগ্য কর্তৃপক্ষের একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় কোনো আপত্তি নেই।

তৃতীয় ধাপ (২০১০ সালে সংশোধিত)

১০. একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার—

(১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বিদ্যমান বিধানাবলী সাপেক্ষে, যে কোনো ব্যক্তি, যিনি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তিনি উক্ত উদ্দেশ্যে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারেন।

(২) যোগ্য কর্তৃপক্ষ,—

(ক) নথি, হলফনামা বা অন্যান্য প্রমাণ, যদি থাকে, পরীক্ষা করে; এবং

(খ) আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, উপধারা (১) এর অধীনে দাখিল করা প্রতিটি আবেদন যত দ্রুত সম্ভব সিদ্ধান্ত নেবে এবং আবেদনটি মঞ্জুর বা প্রত্যাখ্যান করবে, যেমনটি পরিস্থিতি অনুসারে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়, সেখানে যোগ্য কর্তৃপক্ষ তা আবেদনকারীকে জানাবে।

(৩) উপধারা (১) এর অধীনে অনাপত্তি সনদ প্রদানের জন্য আবেদন প্রাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে,—

(ক) যোগ্য কর্তৃপক্ষ যদি এই ধরনের সনদপত্র প্রদান না করে; অথবা

(খ) যেখানে একটি আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তা সনদপত্র প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী ব্যক্তিকে জানানো হয়নি,

সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হবে যে যোগ্য কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান করেছে।

(৪) আবেদনকারী, অনাপত্তি সনদপত্র প্রাপ্তির পর অথবা যেখানে যোগ্য কর্তৃপক্ষ অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান করেছে বলে বিবেচিত হয়, সেখানে আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী ও প্রবিধান অনুসারে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা শুরু করতে এবং তার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অধিকারী হবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার উদ্দেশ্যে,—

(ক) "আবেদনকারী" মানে এমন কোনো ব্যক্তি যিনি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য উপধারা (১) এর অধীনে আবেদন করেন;

(খ) "অনাপত্তি সনদপত্র" মানে একটি সনদপত্র যেখানে উল্লেখ করা থাকে যে, যোগ্য কর্তৃপক্ষের একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় কোনো আপত্তি নেই।"

২০০৪ সালের আইন প্রণয়নের পর থেকে ধারা ১১ নিম্নরূপ সংশোধিত হয়েছে:

"ধারা ১১ (২০০৪ সালে প্রণীত)

১১. কমিশনের কার্যাবলী— আপাতত বলবৎ অন্য

কোনো আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন, কমিশন—

(ক) সংখ্যালঘু শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন, যা এটিকে উল্লেখ করা হতে পারে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া;

(খ) সংখ্যালঘু কর্তৃক তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকারের বঞ্চনা বা লঙ্ঘনের বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি পরীক্ষা করা এবং একটি তফসিলি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি সম্পর্কিত যেকোনো বিরোধের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদন করা; এবং

(গ) কমিশনের সমস্ত বা যেকোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, আনুষঙ্গিক বা সহায়ক হতে পারে এমন অন্যান্য কাজ ও বিষয়গুলি করা।

ধারা ১১ (২০০৬ সালে সংশোধিত)

১১. কমিশনের কার্যাবলী— আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন, কমিশন—

(ক) সংখ্যালঘু শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন, যা এটিকে উল্লেখ করা হতে পারে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্য সরকারকে পরামর্শ দেওয়া;

(খ) স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে, অথবা কোনো সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, সংখ্যালঘু কর্তৃক তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকারের বঞ্চনা বা লঙ্ঘনের বিষয়ে অভিযোগগুলি অনুসন্ধান করা এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি সম্পর্কিত যেকোনো বিরোধের বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত উপযুক্ত সরকারের কাছে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিবেদন করা;

(গ) আদালতের অনুমতি নিয়ে আদালতে সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত অধিকারের কোনো বঞ্চনা বা লঙ্ঘনের সাথে জড়িত যেকোনো কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করা;

(ঘ) সংবিধান বা আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা তার অধীনে সংখ্যালঘুদের শিক্ষাগত অধিকার সুরক্ষার জন্য প্রদত্ত সুরক্ষাগুলি পর্যালোচনা করা এবং সেগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা সুপারিশ করা;

(ঙ) সংখ্যালঘু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানগুলির

সংখ্যালঘু মর্যাদা এবং চরিত্র প্রচার ও সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করা;

(চ) যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী তার মর্যাদা ঘোষণা করা;

(ছ) সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সরকারকে সুপারিশ করা; এবং

(জ) কমিশনের সমস্ত বা যেকোনো উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়, আনুষঙ্গিক বা সহায়ক হতে পারে এমন অন্যান্য কাজ ও বিষয়গুলি করা।"

ধারা ১২, ১২ক, ১২খ, ১২গ, ১২চ এবং ধারা ২২ নিম্নরূপ:

"১২. কমিশনের ক্ষমতা—

(১) কোনো সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এর অধিভুক্তি সম্পর্কিত কোনো বিরোধ দেখা দিলে, সে বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।

(২) কমিশন এই আইনের অধীনে তার কার্যভার পালনের উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানী আদালতের একটি মামলার বিচার করার সমস্ত ক্ষমতা রাখবে এবং বিশেষ করে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, যথা:—

(ক) ভারতের যেকোনো স্থান থেকে কোনো ব্যক্তিকে তলব করা এবং তার উপস্থিতি বলবৎ করা এবং তাকে শপথের মাধ্যমে পরীক্ষা করা;

(খ) কোনো নথি আবিষ্কার এবং উপস্থাপনের দাবি করা;

(গ) হলফনামার ভিত্তিতে প্রমাণ গ্রহণ করা;

(ঘ) ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের (১৮৭২ সালের ১ নং) ধারা ১২৩ এবং ১২৪ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, যেকোনো সরকারি রেকর্ড বা নথি বা এই ধরনের রেকর্ড বা নথির অনুলিপি যেকোনো কার্যালয় থেকে তলব করা;

(ঙ) সাক্ষী বা নথি পরীক্ষার জন্য কমিশন জারি করা; এবং

(চ) অন্য যেকোনো বিষয় যা নির্ধারিত হতে পারে।

(৩) কমিশনের সামনে প্রতিটি কার্যক্রম ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং) ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এর অর্থ অনুযায়ী একটি বিচারিক কার্যক্রম বলে গণ্য হবে এবং ধারা ১৯৬ এর উদ্দেশ্যে, এবং কমিশন ১৯৭৩ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির (১৯৭৪ সালের ২ নং) ধারা ১৯৫ এবং অধ্যায় XXVI এর উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানী আদালত বলে গণ্য হবে।]"

১২ক. যোগ্য কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল—

(১) সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য ধারা ১০ এর উপধারা (২) এর অধীনে যোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনাপত্তি সনদপত্র প্রদানে অস্বীকৃতির আদেশ দ্বারা কোনো ক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই ধরনের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে আপিল করতে পারে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে একটি আপিল আবেদনকারীর কাছে উপধারা (১) এ উল্লিখিত আদেশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন উক্ত ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও একটি আপিল গ্রহণ করতে পারে, যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে সেই সময়ের মধ্যে তা দাখিল না করার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল।

(৩) কমিশনের কাছে একটি আপিল নির্ধারিত ফরমে করতে হবে এবং এর সাথে যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার একটি অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) কমিশন, পক্ষগণের শুনানি করার পর, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি আদেশ পাশ করবে এবং তার আদেশ কার্যকর করার জন্য বা তার প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত নির্দেশনা দেবে।

(৫) উপধারা (৪) এর অধীনে কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ কমিশনের দ্বারা একটি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রি হিসাবে কার্যকরযোগ্য হবে এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি (১৯০৮ সালের ৫ নং) এর বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, একটি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রির ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য হয়, সেভাবেই প্রযোজ্য হবে।

১২খ. একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কমিশনের ক্ষমতা—

(১) ১৯৯২ সালের জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন (১৯৯২ সালের ১৯ নং) এ বিদ্যমান বিধানাবলী সাপেক্ষে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত একটি কর্তৃপক্ষ, যেমনটি পরিস্থিতি অনুসারে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রদানের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, সেই ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সেই কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে আপিল করতে পারে।

(২) উপধারা (১) এর অধীনে একটি আপিল আবেদনকারীর কাছে আদেশ জানানোর তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে দায়ের করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন উক্ত ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও একটি আপিল গ্রহণ করতে পারে, যদি এটি সন্তুষ্ট হয় যে সেই সময়ের মধ্যে তা দাখিল না করার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল।

(৩) কমিশনের কাছে একটি আপিল নির্ধারিত ফরমে করতে হবে এবং এর সাথে যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে তার একটি অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

(৪) উপধারা (৩) এর অধীনে আপিল প্রাপ্তির পর, কমিশন, আপিলের পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ দেওয়ার পর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সংখ্যালঘু মর্যাদা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করবে সেইরকম নির্দেশনা দেবে, এবং এই ধরনের সমস্ত নির্দেশনা পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হবে।

ব্যাখ্যা— এই ধারা এবং ধারা ১২সি এর উদ্দেশ্যে, "কর্তৃপক্ষ" মানে এমন কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা বা কমিশন যা আপাতত বলবৎ কোনো আইন বা উপযুক্ত সরকারের কোনো আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু মর্যাদার সনদপত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে।

১২গ. বাতিলের ক্ষমতা—

কমিশন, একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, যাকে একটি কর্তৃপক্ষ বা কমিশন কর্তৃক সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার পর, নিম্নলিখিত পরিস্থিতিতে এই ধরনের মর্যাদা বাতিল করতে পারে, যথা:-

(ক) যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির গঠন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, যা এটিকে সংখ্যালঘু মর্যাদা পেতে সক্ষম করেছে, পরবর্তীতে এমনভাবে সংশোধিত হয় যে এটি আর একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা চরিত্রকে প্রতিফলিত করে না;

(খ) যদি, পরিদর্শন বা তদন্তের সময় নথি যাচাই করে দেখা যায় যে, সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কোনো শিক্ষাবর্ষে ভর্তির নিয়মাবলী এবং নির্ধারিত শতাংশ অনুযায়ী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

১২চ. এখতিয়ারের বাধা— এই অধ্যায়ের অধীনে প্রদত্ত কোনো

আদেশের বিষয়ে কোনো আদালত (সংবিধানের ২২৬ এবং ২২৭ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগকারী সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্ট ব্যতীত) কোনো মামলা, আবেদন বা অন্য কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করবে না।

২২. আইনের অগ্রাধিকারমূলক প্রভাব—

এই আইনের বিধানাবলী আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বা এই আইন ব্যতীত অন্য কোনো আইনের বলে কার্যকর কোনো দলিলে এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও কার্যকর হবে।"

১৩. জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, যা ২০০৪ সালে মূলত প্রণীত হয়েছিল, ধারা ১০ দ্বারা শুধুমাত্র সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পছন্দের একটি তফসিলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজ হিসাবে স্বীকৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এই পর্যায়ে, এনসিএমইআই-এর কার্যকারিতা শুধুমাত্র তিনটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যথা: উপধারা (ক) এর অধীনে একটি উপদেষ্টা কার্য; উপধারা (খ) এর অধীনে সংখ্যালঘু কর্তৃক তাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার অধিকারের বঞ্চনা বা লঙ্ঘন এবং তফসিলি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধিভুক্তি সম্পর্কিত যেকোনো বিরোধের বিষয়ে নির্দিষ্ট অভিযোগগুলি পরীক্ষা করা; এবং উপধারা (গ) এর অধীনে এনসিএমইআই-এর উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সমস্ত কাজ করার একটি অবশিষ্ট ধারা। ২০০৬ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা একটি বিশাল পরিবর্তন আসে। এই সংশোধনী দ্বারা, যে ব্যক্তি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তাকে ধারা ১০ এর অধীনে উক্ত উদ্দেশ্যে যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে একটি অনাপত্তি সনদের জন্য আবেদন করতে হবে। একই সাথে, ধারা ১১ এর অধীনে, এনসিএমইআই-এর কার্যকারিতা এবং ক্ষমতাগুলি উপরে উল্লিখিত মূল উপধারা (ক) থেকে (গ) এর বাইরে প্রসারিত করা হয়েছিল, যার মধ্যে উপধারা (চ) এর অধীনে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তার মর্যাদা ঘোষণা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০০৬ সালের একই সংশোধনী আইন ধারা ১২ক এর অধীনে যোগ্য কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে এবং ধারা ১২খ এর অধীনে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ, যারা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রদানের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে এনসিএমইআই-কে আপিলের ক্ষমতাও প্রদান করেছিল। কিছু পরিস্থিতিতে কোনো কর্তৃপক্ষ বা এনসিএমইআই কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র বাতিল করার ক্ষমতাও এনসিএমইআই-কে অর্পণ করা হয়েছিল।

১৪. ২০১০ সালের সংশোধনী আইন "আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে বিদ্যমান বিধানাবলী সাপেক্ষে..." অভিব্যক্তিটি যুক্ত করেছে।

থেকে ২০০৪ সালের আইনের ১০ (১) ধারা।

১৫. প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, ২০০৪ সালের আইনের ধারা ১০(১) এবং ধারা ১১(চ) এর বিধানগুলির মধ্যে একটি সংঘাত রয়েছে। তবে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করলে এটি স্পষ্ট হবে যে, এনসিএমইআই-এর ক্ষমতা ধারা ১১(চ) এর অধীনে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাই কিছু থাকুক না কেন, তা প্রয়োগ করা হবে। অন্যদিকে, ধারা ১০ এর অধীনে অনাপত্তি সনদ প্রদানকারী যোগ্য কর্তৃপক্ষ কেবল আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে তা করতে পারে।

১৬. দ্বিতীয়ত, ধারা ১১(চ) একটি অত্যন্ত ব্যাপক বিধান যা এনসিএমইআই-কে একটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সেই অনুযায়ী তার মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়। "সমস্ত প্রশ্ন" এবং "সম্পর্কিত" উভয় অভিব্যক্তিই ব্যাপক অর্থ বহন করে, যা এনসিএমইআই-কে একটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভূত হতে পারে এমন যেকোনো প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। নিজেই বিবেচনা করলে, ধারা ১১(চ) সমস্ত পর্যায়ে একটি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে মর্যাদা ঘোষণাকে অন্তর্ভুক্ত করবে। ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সকল সংখ্যালঘুদের তাদের পছন্দসই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করার মৌলিক অধিকার প্রদান করে। ধারা ১১(চ) এর অধীনে ক্ষমতা, যদি এটি নিজেই পড়া হয়, তবে এটি এনসিএমইআই-কে একটি সংখ্যালঘু কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং/অথবা পরিচালনা করার অধিকার সম্পর্কিত উদ্ভূত যেকোনো প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেবে। এই ক্ষমতা সেখানেই থেমে যায় না। এতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, যাতে এটি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীনে নিশ্চিত মৌলিক অধিকারের সুবিধা নিতে পারে।

১৭. তবে, ধারা ১০(১), যা ২০০৬ সালের সংশোধনী আইন দ্বারা ধারা ১১(চ)-এর সাথে একই সময়ে প্রবর্তিত হয়েছিল, ধারা ১১(চ)-এ বিদ্যমান উল্লিখিত ক্ষমতার একটি দিক নির্দিষ্ট করে, যেমন একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার সূচনালগ্নে অনাপত্তি সনদ প্রদান। সুতরাং, ২০০৬ সালের সংশোধনী আইন কার্যকর হওয়ার পর যে কোনো ব্যক্তি একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তাকে উক্ত উদ্দেশ্যে অনাপত্তি সনদ প্রাপ্তির জন্য কেবলমাত্র যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। শ্রী হেগড়ের এই যুক্তিকে সমর্থন করা কিছুটা কঠিন যে উক্ত ক্ষমতাগুলি সমবর্তী। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে পাঠ করলে, ২০০৬ সালের সংশোধনী আইনের পর একটি

সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য সমস্ত আবেদন কেবল আইন অনুসারে গঠিত যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছেই যাবে।অন্যদিকে, প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর যেকোনো পর্যায়ে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর মর্যাদা ঘোষণার জন্য, এনসিএমইআই-এর সেই প্রশ্নটি সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের সংখ্যালঘু মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতা থাকবে।

১৮. আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এই বিধানগুলির পরিধি সম্পর্কে বিভিন্ন হাইকোর্ট পরস্পরবিরোধী মতামত দিয়েছে। কলকাতা, বোম্বে এবং পাঞ্জাব হাইকোর্ট এই মত দিয়েছে যে, আপিল ক্ষমতাকে মূল ক্ষমতার সাথে গুলিয়ে ফেলা যায় না এবং তাই, যখন একটি সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ঘোষণার প্রশ্ন আসে, তখন ধারা ১১(চ) একেবারেই প্রয়োগ করা যাবে না। এই মতামত, ধারা ১১(চ)-কে অকার্যকর করার পাশাপাশি, আইনের ধারা ১২(২)-কেও উপেক্ষা করে, যা একটি দেওয়ানী আদালতের কিছু ক্ষমতা প্রদান করে, এবং এই ক্ষমতাগুলি শুধুমাত্র প্রথম দৃষ্টান্তের আদালতের সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে, এলাহাবাদ হাইকোর্ট এই মত দিয়েছে যে, ধারা ১০ এবং ১১(চ) ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে: ধারা ১০ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য অনাপত্তি সনদ প্রদানের ক্ষমতা এবং ধারা ১১(চ) একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত।

১৯. এই আদালত সরাসরি আমাদের সামনে উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিষয়টি স্পর্শ করেছে। এইভাবে, পি.এ.ই.এম. কলেজের গভর্নিং বডি বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্য মামলায়, যা ০৬.১২.২০১২ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এই আদালত ২০০৪ সালের আইনের ধারা ১১(চ) এবং ১২খ উল্লেখ করার পর রায় দিয়েছে:

"উপরোক্ত বিধানাবলী থেকে এটি স্পষ্ট যে, কমিশন একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সেই অনুযায়ী তার মর্যাদা ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখে। উপরন্তু, ধারা ১২খ এর অধীনে, যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোনো রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কর্তৃপক্ষ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রদানের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে, সেখানে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সেই কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনের কাছে আপিল করতে পারে। সুতরাং, ২০০৪ সালের আইনের ধারা ১১(চ) এবং সংশোধনী আইনের ধারা ১২খ-তে বিদ্যমান বিধানাবলী, একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন সিদ্ধান্ত নেওয়ার এবং সেই মর্যাদা ঘোষণার জন্য সম্পূর্ণ বিধান।"

২০. কর্পোরেট এডুকেশনাল এজেন্সি বনাম জেমস ম্যাথিউ, (২০১৭) ১৫ এসসিসি ৫৯৫ (৬০০-৬০১ পৃষ্ঠায়), এই আদালতের একটি ডিভিশন বেঞ্চ হাইকোর্টের একটি রায় নিয়ে কাজ করেছে, যা সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিয়োগ নিয়ে কাজ করেছিল।

এই আদালত, আপিলকারীকে ইতিমধ্যেই বিদ্যমান সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লেখ করার পর, এই রায় দিয়েছে:

"৯. অধ্যায় ।।। সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার নিয়ে আলোচনা করে। ধারা ১০ এর অধীনে, যে কেউ একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ইচ্ছুক, তাকে একটি "অনাপত্তি সনদপত্র" এর জন্য যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হবে। আইনের ধারা ২(গক) এর অধীনে "যোগ্য কর্তৃপক্ষ" কে উপযুক্ত সরকার কর্তৃক সংখ্যালঘুদের দ্বারা তাদের পছন্দের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার জন্য "অনাপত্তি সনদপত্র" প্রদানের জন্য নিযুক্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

১১. অতএব, ২০০৪ সালের জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন প্রবর্তনের পর, একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সম্পর্কিত সনদপত্র জারি করা জাতীয় কমিশনের এখতিয়ার এবং ম্যান্ডেটের অন্তর্ভুক্ত। কমিশন একবার এইভাবে একটি সনদপত্র জারি করলে, তা একটি বিদ্যমান মর্যাদার ঘোষণা।"

২১. এই রায় দ্ব্যর্থহীনভাবে ধরে যে, বিদ্যমান সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে, ধারা ১১(চ) স্পষ্টতই এনসিএমইআই-কে সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা সম্পর্কিত একটি সনদপত্র জারি করার এখতিয়ার প্রদান করে। আমরা উপরোক্ত মতামতের সাথে বিনয়ের সাথে একমত পোষণ করি।

২২. তবে, শ্রী ধাওয়ান আমাদেরকে অনুরোধ করেছেন মেধার ভিত্তিতে নতুন করে শুনানির জন্য বিষয়টি এনসিএমইআই-এর কাছে ফেরত পাঠাতে। আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, কলেজটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে শুরু হয়েছিল এবং পরে মাঝপথে একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে চেয়েছিল, যা শ্রী ধাওয়ানের মতে অনুমোদিত ছিল না – এই যুক্তিটি বিজ্ঞ একক বিচারকের সামনে উত্থাপিত হয়নি। তবে, এই যুক্তিটি ডিভিশন বেঞ্চের সামনে উত্থাপিত হয়েছিল এবং উভয় বিচারকই এই বলে উত্তর দিয়েছিলেন যে, অনুচ্ছেদ ৩০ এর অধীনে মৌলিক অধিকার মওকুফ করা যায় না। এই মতামতের সাথে একমত পোষণ করে, মামলার তথ্যের উপর ভিত্তি করে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এনসিএমইআই-এর ০৫.১১.২০০৯ তারিখের আদেশ গ্রহণ করেছে, যেখানে এনসিএমইআই উপরোক্ত প্রশ্নে প্রবেশ করেছিল। অতএব, এই বিষয়টি একটি গভর্নিং বডির ইচ্ছায় নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ফেরত পাঠানো সঙ্গত হবে না, কারণ সেই গভর্নিং বডি এখন আর সোসাইটি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলেজ পরিচালনা করার দাবি করতে পারে না।

০৪.০৫.২০০৯ তারিখের একটি চিঠিতে ক্লুনি উইমেনস কলেজের অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অনুরোধ করেছিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবিধি অনুযায়ী গঠিত গভর্নিং বডির মেয়াদ কেবল নতুন গভর্নিং বডি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো হোক। যেহেতু ক্লুনি উইমেনস কলেজ একটি সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ভিত্তিতে নতুন গভর্নিং বডি গঠিত হয়েছে, আমাদের মতে, সমান্তরাল গভর্নিং বডি, যা নিজেদেরকে চালিয়ে যাওয়ার দাবি করে, নতুন গভর্নিং বডি গঠনের পর তার আর দাঁড়ানোর কোনো ভিত্তি নেই। যেহেতু বিষয়টি এমন, আমরা শ্রী ধাওয়ানের মক্কেলের ইচ্ছায় মেধার ভিত্তিতে নতুন করে শুনানির জন্য বিষয়টি এনসিএমইআই-এর কাছে ফেরত পাঠাতে ইচ্ছুক নই।

২৩. সেই অনুযায়ী, আপিল মঞ্জুর করা হলো এবং কলকাতা হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হলো। ২৩.১০.২০০৭ তারিখের আদেশ এবং ২৫.১০.২০০৭ তারিখের সনদপত্র আইনত বৈধ বলে ঘোষণা করা হলো।

২৪. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আপিলগুলির ব্যাচ এই রায় অনুসারে নিষ্পত্তি করা হলো।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আপিল খারিজ করা হয়েছে।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal